গ্রন্থবীক্ষণ

স্বামীজীর মানসপুত্র নেতাজী

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

স্বামী চৈতন্যানন্দ (সঙ্কলক ও সম্পাদক), *বিবেক-দ্যুতিতে উদ্ভাসিত সুভাষচন্দ্র*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, ২০২২, পৃষ্ঠাসংখ্যা : আঠারো + ৯৩২, মূল্য : ৫০০ টাকা।

চল্লিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই স্বামী বিবেকানন্দ যখন দেহ রাখলেন, সুভাষচন্দ্র তখন সাড়ে পাঁচ বছরের শিশু। মুখোমুখি সাক্ষাতের সুযোগ তাঁদের হয়নি। তবু সুভাষচন্দ্রের যে-আটচল্লিশ বছরের কর্মব্যস্ত জীবনকাল সম্পর্কে আমরা অবহিত সেটি স্বামীজী দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত, একথা ইতঃপূর্বে বহু চিন্তাবিদ-গবেষক উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত বিষয়টি প্রথম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন কবি-মনস্বী মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বিবেকানন্দের উত্তরসাধক' সংক্রান্ত আলোচনায় : ''নেতাজী যে এক অর্থে স্বামীজীর মানস-পুত্র তাহাতে সন্দেহ নাই; একজনের হৃদয়ে যাহা বীজরূপে ছিল আর-একজনের জীবনে তাহাই বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছে।... স্বামীজী যদি গেরুয়া ত্যাগ করিতেন তবে সে আর কিছুর জন্য নয়—ওই 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর 'নেতাজী' হইবার জন্য। সেই প্রেম তাঁহারও ছিল, কেবল যে-জন্য জ্ঞানের তপস্যাকে সংবরণ করিয়া কিছুকাল প্রেমের সমাধিতে সংজ্ঞাহারা হইতে হইত। অতএব স্বামীজীর মধ্যে আমরা যেমন নেতাজীর ওই প্রেমের মূল দেখিতে পাই, তেমনই নেতাজীর মধ্যে স্বামীজীর সেই বাণীকেই মূর্তিমান হইতে দেখি। সেই একমন্ত্র—'Believe that you are free, and you will be.' '' কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে' নিবন্ধে লিখেছেন, ''এক বীর্যবান সন্ন্যাসীকে মনে পড়ছে। আমাদের মাতৃভূমি যখন এক শতাব্দীকাল পূর্বে পাশ্চাত্যভূমি থেকে আগত জড়বাদী চিন্তাবন্যার তরঙ্গাঘাতে মুহুর্মুহু প্লাবিত, ক্ষুব্ধ, মুগ্ধ ও বিপর্যস্ত হচ্ছিল, তখন অকুণ্ঠ-জীবন, তরুণ সন্ন্যাসী সেদিনের সেই প্লাবনকে আপনার কণ্ঠোচ্চারিত বাণীতে... সংযত করেছিলেন।... মনে করতে ভাল লাগে, আমাদের এই মাতৃভূমির আকর্ষণেই সেই তরুণ সন্ন্যাসী আপনার গৈরিক পরিত্যাগ করে পরবর্তী জন্মে যোদ্ধার ভূমিকায় সুভাষচন্দ্র হয়ে জন্মলাভ করেছিলেন।'' বিবেকানন্দে উদ্ভাসিত

সুভাষচন্দ্র বিষয়ে গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর এক কৃশকায় স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে; তিনি তাঁর 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, ''ছেলেটির [সুভাষচন্দ্র] দোষ নেই। তার মধ্যে তখন আগুন ধরে গেছে। তার মনদাহ ও গৃহদাহের শুভকর্মটি করেছিলেন চিরকালের তরুণ এক সন্ন্যাসী—আগুন লাগানোই যাঁর কাজ...।''

অন্বেষণের আয়োজন

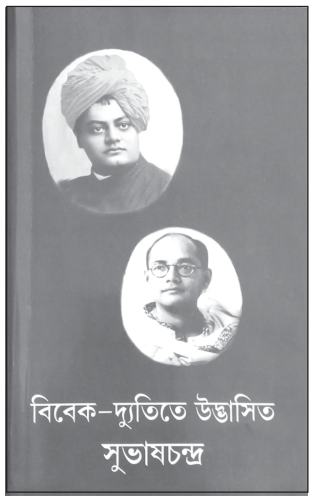

কিন্তু এ তো সার্বিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে নানা মতামত। বিবেক-দ্যুতিতে সুভাষচন্দ্র ঠিক কতটা উদ্ভাসিত, তাঁর কর্মজীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে, কীভাবে—সে-সম্পর্কে এত বিস্তারিত অন্বেষণ এর আগে কখনও হয়নি। আমাদের সৌভাগ্য, 'উদ্বোধন' পত্রিকা এবং অনেকগুলি সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ স্বামী চৈতন্যানন্দজী মহারাজ এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। সংকলিত নানা প্রবন্ধে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে এই বিষয়টি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মের ১২৫ বছর উদ্‌যাপনের লগ্নে প্রকাশিত হয়েছে ৯৫০ পৃষ্ঠার এই সুমুদ্রিত সংকলন গ্রন্থটি। সেইসঙ্গে দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর এক উজ্জ্বল সমাপতন।

'প্রকাশকের নিবেদন'-এ স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ শুরুতেই জানিয়েছেন, এখানে সংকলিত ''৪৬টি প্রবন্ধের মধ্যে শিরোনামেই ৪২টি প্রবন্ধে একযোগে স্বামীজী এবং নেতাজী উপস্থিত আছেন। সেটিই কাম্য। 'স্বামীজীর ভাবশিষ্য সুভাষচন্দ্র'—এ ভাবটিই [এই গ্রন্থের] প্রধান উপজীব্য। মাত্র ৪টি প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্র একা এবং কোন প্রবন্ধই কেবলমাত্র স্বামীজীকে নিয়ে নয়। তা হওয়া উচিতও নয়। কারণ, সম্পাদক মহারাজের মনোগত ইচ্ছা—স্বামীজীর দেশপ্রেম যা এযাবৎ তেমন গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়নি তা সুভাষচন্দ্রের মাধ্যমেই জনগণ ভালভাবে জানুন।''

প্রবন্ধগুলি পাঁচটি পর্বে বিন্যস্ত : 'স্বামীজী ও সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে', 'মননে ও বিশ্লেষণে', 'শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও ধর্ম', 'ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতি' এবং 'বিবিধ'। সবাই বোঝেন, এমন পর্ব বিভাজন তর্কাতীত হওয়া অসম্ভব। এই রচনাটি অমুক পর্বে যেতে পারত, অথবা ওই রচনাটির অন্য পর্বে স্থানান্তর হলেই বা ক্ষতি কী হত—এমন বাদানুবাদ অর্থহীন। বরং সপ্রশংস উল্লেখ করা দরকার, সম্পাদক মহারাজের সতর্ক দৃষ্টির কারণে বিভিন্ন প্রবন্ধে একই উদ্ধৃতির পুনরুল্লেখ অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত। আলোচ্য বিষয়ের পৌনঃপুনিকতা অবশ্য অনিবার্য। যেমন, রাইকমল দাশগুপ্ত লিখিত 'স্বামীজী ও সুভাষচন্দ্র : ঝাঁসীর রানী' (পৃষ্ঠা ৬৮) আর সবুজকলি সেন লিখিত 'বিবেকানন্দের আলোয় সুভাষচন্দ্রের নারী-ভাবনা' (পৃষ্ঠা ৮৬), অথবা গৌতম হালদার লিখিত 'বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র : শিল্পকলা' (পৃষ্ঠা ৪২১) আর সুমিত মুখোপাধ্যায় লিখিত 'স্বামীজীর শিল্পভাবনার আলোকে নেতাজীর শিল্পচিন্তা' (পৃষ্ঠা ৬৬৯) প্রবন্ধদ্বয়ে বিষয়গত সাযুজ্য আছেই। একই বিষয় অনেক সময় ঘুরে ফিরে এসেছে অনুপ রায়চৌধুরী লিখিত 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্রের চোখে মানুষ' (পৃষ্ঠা ১৮০), গোপেন্দ্র চৌধুরী লিখিত 'বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্রের সেবাযজ্ঞ' (পৃষ্ঠা ১৯১), স্বামী

চৈতন্যানন্দ লিখিত 'বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্রের মানবতাবাদ' (পৃষ্ঠা ২৭১), রাধারমণ চক্রবর্তী লিখিত 'কৃষি ও শ্রমজীবী শ্রেণির সমুন্নতি : স্বামীজীর ভাবসংযোগে নেতাজীর কর্মযোগ' (পৃষ্ঠা ৫৫৩), অর্পিতা মুখার্জি লিখিত 'বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে শ্রেণি-বৈষম্যহীন সমাজভাবনা' (পৃষ্ঠা ৫৬৮), রীতা ব্যানার্জী লিখিত 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র বসুর সমাজদর্শন' (পৃষ্ঠা ৬০৪) এবং বিষ্ণুপদ নন্দ লিখিত 'বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে ভারতের শ্রমজীবী মানুষ' (পৃষ্ঠা ৬৫১) প্রবন্ধগুলিতে। অনুরূপ কথা বলা যেতে পারে শাশ্বতী দত্ত রচিত 'ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র' (পৃষ্ঠা ২০৬), গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র : ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভূমিকা' (পৃষ্ঠা ৪৯৫), মনিকা সেনগুপ্ত রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম' (পৃষ্ঠা ৫১৬) এবং গণপতি সামন্ত রচিত 'স্বামীজী ও নেতাজী : ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের উপর প্রভাব' (পৃষ্ঠা ৫৩৬) প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে; অথবা, শক্তিপ্রসাদ মিশ্র রচিত 'স্বামীজী ও নেতাজীর ভাবনায় স্বাধীন ভারতের রূপরেখা' (পৃষ্ঠা ৩৩০), স্বামী কৃষ্ণনাথানন্দ রচিত 'বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্রের ভাবনায় ভারতীয় অর্থনীতি' (পৃষ্ঠা ৬২৭), গৌতমকুমার পাল রচিত 'স্বামীজীর আলোকে ন্যাশনাল প্ল্যানিং-এর স্রষ্টা নেতাজী' (পৃষ্ঠা ৬৮৪) এবং পবিত্রকুমার গুপ্ত রচিত 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অর্থনৈতিক চিন্তার রূপরেখা' (পৃষ্ঠা ৭৮৩) প্রবন্ধগুলি সম্পর্কেও।

কিছু লেখায় এক-একটি বিষয়ে স্বামীজী ও নেতাজীর বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু সেই বিশেষ বিষয়ে বিবেক-দ্যুতিতে সুভাষচন্দ্র কতটা উদ্ভাসিত তার কোনও স্পষ্ট হদিশ পাওয়া যায়নি; যেমন, সুস্মিতা ঘোষের 'স্বামীজী ও সুভাষচন্দ্র : বিশ্বের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব' (পৃষ্ঠা ৪৭), পিনাকী ভাদুড়ির 'বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র : হাস্যরসিক ও কৌতুকপ্রিয়' (পৃষ্ঠা ৩৯৯) অথবা কবিতা সরকারের 'বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র : ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি' (পৃষ্ঠা ৪৫২) প্রবন্ধগুলি। বরং গ্রন্থনামকে শিরোধার্য করে অত্যন্ত বিষয়নিষ্ঠ আলোচনা শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'সুভাষচন্দ্রের অন্তর্লোকে বিবেক-বাণীর জয়যাত্রা' (পৃষ্ঠা ৩), স্বামী সুবীরানন্দজীর 'সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনে স্বামীজীর প্রভাব' (পৃষ্ঠা ৮) এবং বারিদবরণ ঘোষের 'আন্তর্জাতিকতা ও স্বামীজীর ভাবশিষ্য নেতাজী : কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য' (পৃষ্ঠা ৭৯৩)। অল্প আলোচিত বিষয়ে নিজস্ব ভাবনার ছাপ স্বামী সুপর্ণানন্দজীর 'বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র : বীর যোদ্ধা' (পৃষ্ঠা ১৯), স্বামী চৈতন্যানন্দজীর 'বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্রের মানবতাবাদ' (পৃষ্ঠা ২৭১), প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণাজীর 'স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনার আলোকে সুভাষচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতা' (পৃষ্ঠা ৪৭২), এবং অমিয়কুমার মজুমদারের 'সুভাষচন্দ্রের দর্শন-ভাবনা' (পৃষ্ঠা ৪৮৮) রচনাগুলিতে।

কিন্তু এমন খণ্ড ক্ষুদ্র করে এই মহার্ঘ্য গ্রন্থের যথার্থ বীক্ষণ সম্ভব নয়। তার জন্য সামগ্রিকভাবে এই সংকলন গ্রন্থ থেকে কী আহরণ করা গেল তার এক রোমন্থন করা দরকার। তাহলেই এই সুপরিকল্পিত বইটি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ পাঠকের কাছে এক নির্দিষ্ট ধারণা তৈরি করে দেওয়া যাবে, তাঁদের আগ্রহ জাগানো যাবে—আলোচকের যা কর্তব্য। এবং তা করার জন্য নিখাদ আবেগ এবং কষ্টকল্পনা সরিয়ে বিবেক-দ্যুতিতে সুভাষচন্দ্র কেমনভাবে উদ্ভাসিত তার এক কালানুক্রমিক প্রামাণ্য নিদর্শন সাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি—প্রধানত এই বই থেকে উপাদান সংগ্রহ করেই।

বিবেক-দ্যুতিতে উদ্ভাস : কালানুক্রমে

পাঁচ বছর বয়সে সুভাষচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ ইউরোপীয় আবহে প্রোটেস্ট্যান্ট ইউরোপীয় স্কুলে। বারো বছর বয়সে কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়ে তাঁর বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা চর্চা শুরু। এখানে মাত্র আড়াই বছরের জন্য তিনি প্রধান শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন বেণীমাধব দাসকে, যাঁর কাছে তাঁর নৈতিকতা ও প্রকৃতিপ্রেমের প্রাথমিক পাঠ। এই বয়ঃসন্ধিকালেই গতানুগতিক পার্থিব জীবনের প্রতি তাঁর মানসিক বিদ্রোহ দানা বাঁধতে থাকে। মনোজগতের এই অস্থিরতার কালে বিবেকানন্দের বার্তা সরাসরি পৌঁছল পনেরো বছরে পা দেওয়া সুভাষচন্দ্রের কাছে। সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতিকথা নেতাজীর নিজের ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে এই গ্রন্থের একাধিক স্থানে : ''একদিন নেহাতই দৈবক্রমে এমন একটি জিনিস পেয়ে গেলাম, যা দেখা গেল, এই সঙ্কটকালে আমার প্রধান সহায়। আমার এক আত্মীয় বন্ধু (সুহৃৎ চন্দ্র মিত্র) পাশের বাড়িতে থাকতেন। তিনি শহরে নতুন এসেছিলেন এবং আমাকে তাঁর কাছে প্রায়-ই যেতে হতো। তাঁর বইগুলির উপর চোখ বোলাতে-বোলাতে নজরে এসে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী। কয়েক পৃষ্ঠা উল্টেছি কি ওল্টাইনি, অবিলম্বে বুঝতে পারলাম—এতে এমন কিছু আছে যা এতদিন আমি খুঁজে মরছি। বইগুলি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে এনে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। মজ্জাবধি শিহরণ খেলে গেল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার মধ্যে সৌন্দর্য ও নীতিবোধ জাগ্রত করে আমার জীবনে নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু এমন কোন আদর্শ তাঁর কাছ থেকে লাভ করিনি, যার জন্য সমগ্র সত্তাকে আমি উৎসর্গ করতে পারি। বিবেকানন্দ তা-ই এনে দিলেন'' (পৃষ্ঠা ৯)। কিশোর সুভাষচন্দ্রকে সর্বাপেক্ষা অনুপ্রাণিত করল স্বামীজীর চিঠিপত্র এবং কলম্বো থেকে আলমোড়া বক্তৃতাগুচ্ছ। বিশেষত বক্তৃতাগুলি পড়ার পর স্বামীজীর শিক্ষার মূলকথা সম্বন্ধে তাঁর এক স্পষ্ট ধারণা হল : 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। তাঁর প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতিকালে, কয়েক মাসের জন্য কোদালিয়া ও কলকাতায় আসা মা প্রভাবতী দেবীকে সুভাষচন্দ্র কটক থেকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন তাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং বিবেকানন্দের রচনাবলীর স্পষ্ট প্রভাব (পৃষ্ঠা ২৩২)। প্রবেশিকা পরীক্ষার মাস দুই আগে ৮ জানুয়ারি, ১৯১৩ ইংল্যান্ড-প্রবাসী মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুকে লিখলেন, ''আশার দূত আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন আমাদের প্রাণের সকল তমঃ নাশ করিয়া হৃদয়ে অনির্বাণ শিখা জ্বালাইতে, তিনি ঋষি বিবেকানন্দ'' (পৃষ্ঠা ১৮৩, ২৩৯)।

১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সুভাষচন্দ্র ভর্তি হলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানে ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে সমন্বয় খোঁজা একদল বিবেকানন্দ-অনুরাগী ছাত্রদের নিয়ে তিনি তৈরি করলেন 'Neo-Vivekananda Group'। ১৯১৪ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে কিছু না জানিয়ে তিনি হিমালয় ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য, গুরুর সন্ধান এবং সন্ন্যাসগ্রহণ। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় আখড়ায় নানা রকমের অনুদারতা প্রত্যক্ষ করে বীতশ্রদ্ধ সুভাষচন্দ্র সমতলে ফিরে আসেন। ফেরার পথে উপস্থিত হন কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে। তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী সেখানে উপস্থিত। সুভাষচন্দ্র তাঁর কাছে সংসার ত্যাগের বাসনা ব্যক্ত করলেন। ব্রহ্মানন্দজীর উত্তর কী ছিল সে-কথা সুভাষচন্দ্র তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে শুনিয়েছিলেন, ''যে কৃপা পায় তার জীবন বদলে যায়ই।... আমিও পেয়েছি এ-কৃপার আভাস। তাই

তো চাই দেশের কাজে জীবন ঢেলে সার্থক হতে। এও তোমাকে বলছি, ঐ রাখাল-মহারাজই [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] আমাকে কাশী থেকে ফিরিয়ে পাঠান, বলেন, আমাকে দেশের কাজ করতে হবে" (পৃষ্ঠা ১৫১)।

অধ্যাপক ওটেন-সংক্রান্ত বিতর্কে জড়িয়ে সুভাষচন্দ্র কটকে ফিরে আসেন এবং ৫০-৬০জন বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে দরিদ্রদের বসতিতে নানা সেবামূলক কাজ করতে থাকেন। এমনকী কলেরা ও বসন্ত রোগীদেরও শুশ্রূষার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। সুভাষচন্দ্র এই দলের নাম দেন 'নার্সিং ব্রাদারহুড'। তাঁর নেতৃত্বে সেই দল কটক থেকে মাইল আট দূরে নরাজ পর্যন্ত 'বন্দে মাতরম্' আর 'সন্ন্যাসীর গীতি' গাইতে গাইতে রুট মার্চ করে যেতেন। সুভাষচন্দ্রের বাল্যবন্ধু চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের কাছে বলেছিলেন, ''সুভাষকে তখন দেখে মনে হতো যেন 'বাডিং বিবেকানন্দ' এবং ভবিষ্যতের আই. এন. এ.-র সূত্রপাত সেখানেই" (পৃঃ ২৪১)। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র লেখেন, এই দরিদ্র সেবার ''ধারণাটা সম্ভবত বিবেকানন্দের কাছ থেকে এসেছিল,... কারণ, তাঁর মতে, দরিদ্রের বেশেই ঈশ্বর মাঝে-মাঝে আমাদের মধ্যেই আবির্ভূত হন আর দরিদ্রের সেবাই নারায়ণসেবা" (পৃঃ ২৩৮)। উল্লেখ্য সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনা তখনও দানা বাঁধেনি।

আই সি এস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেও ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সুভাষচন্দ্র ইংল্যান্ড থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে যে ঐতিহাসিক চিঠিটি দেন সেখানেও সেবার কথা এবং কর্মযোগীর মনস্কতা মূর্ত : ''আপনি বাংলাদেশে আমাদের সেবাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার যৎসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে আমার উৎসর্গ করিবার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর।... আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি আজ প্রস্তুত—আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন।"

১৯২৪ সালে নবগঠিত 'স্বরাজ্য' পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন, সুভাষচন্দ্র হন প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিক। দেশবন্ধু মেয়র হিসেবে তাঁর প্রথম ভাষণেই দরিদ্র নাগরিকদের জন্য বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সুভাষচন্দ্রের সহায়তায় তিনি সেই লক্ষ্যে সুচারুভাবে কাজ শুরুও করেছিলেন। এমন সময় 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট' অনুসারে ব্রিটিশ সরকার কার্যত বিনা বিচারে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করেন। এই প্রথম কারাবাসের কালে বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে ৯ অক্টোবর ১৯২৫ তিনি চিঠি লেখেন, ''বিবেকানন্দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়।... নানা কারণে আমাদের জাতির কর্মের দিকটা শূন্য হয়ে এসেছে, তাই এখন আমাদের দরকার রজোগুণের 'double dose'."

১৯২৬ সালে ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে অন্তরীণ অবস্থায় তিনি তাঁর কলকাতার এক সতীর্থকে চিঠি লিখে যুবক-যুবতীদের আদর্শের কথা বিস্তারিত লেখেন; সেখানে যেন স্বামী বিবেকানন্দের কথার প্রতিধ্বনি। তিনি যুবকটিকে যেসব বই পড়ার পরামর্শ দেন তার মধ্যে রয়েছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'চিকাগো বক্তৃতা' ও 'ভাববার কথা'।

মুক্তি পাওয়ার পর সুভাষচন্দ্রের ব্যস্ত রাজনৈতিক জীবন। এই পর্বে তিনি বিভিন্ন বক্তৃতায় বারংবার স্বামীজীর কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলি এই গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উদ্ধৃত।

এরপর ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বন্দি করে দেশান্তরে নির্বাসিত করেন। এই পর্বে ভিয়েনায় থাকাকালীন ১৯৩৫ সালে তাঁর 'Indian Struggle 1920-34' বইটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। তার ভূমিকায় তিনি ভারতবর্ষের তৎকালীন সংগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। স্বামীজীকে তিনি আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 'Spiritual father' হিসাবে অভিহিত করেন। এই ভিয়েনায় থাকাকালীন তিনি তাঁর চেয়ে বয়সে বছর সাতেকের বড় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী কালে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের কাছে সুনীতিকুমার জানান, ''আমার নিজের মনে হয়েছে, বিবেকানন্দের প্রভাব ছাড়া যে সুভাষচন্দ্রকে ভারতবর্ষ দেখেছে তার আত্মপ্রকাশ সম্ভবই ছিল না।" ['চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ'-গ্রন্থে সংকলিত]

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নির্বাসিত অবস্থায় সুভাষচন্দ্রকে তখন বিদেশের নানা স্থানে ঘোরানো হচ্ছে। নির্বাসন পর্বের শেষ দিকে সুভাষচন্দ্র ৬ মার্চ ১৯৩৬ 'উদ্বোধন' পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দজীকে এক চিঠি লেখেন। আলোচ্য গ্রন্থটির কেন্দ্রীয় ভাবনার সঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হওয়ায় সেই চিঠিটি অংশত বারবার উদ্ধৃত, সম্পূর্ণত পুনর্মুদ্রিত এই গ্রন্থের 'বিবিধ পর্ব' অংশে (পৃষ্ঠা ৮৫৪) : ''শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। 'নিবেদিতার' মত আমিও মনে করি যে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের (স্বরূপের) দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজি জীবিত থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হউক, যত দিন জীবিত থাকিব ততদিন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে'র একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব—এ কথা বলা বাহুল্য।"

দেশে ফিরিয়ে এনে ব্রিটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রকে তাঁদের এলগিন রোডের নিজেদের বাড়িতে নজরবন্দি করে রাখেন, কিন্তু সেখান থেকে নেতাজীর নায়কোচিত মহানিষ্ক্রমণ। শোনা যায় অন্তর্ধানের আগের দিন গোপনে ভাইঝি ইলা বসুকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে পাঠিয়েছিলেন মা ভবতারিণীকে পূজা দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

'আজাদ হিন্দ বাহিনী'র সদর কার্যালয় যখন সিঙ্গাপুরে, তখন প্রায়ই গভীর রাত্রে তিনি একা চলে যেতেন সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রে। সেনানীর পোশাক বদলে পট্টবস্ত্র পরে ঠাকুরঘরে দীর্ঘক্ষণ ধ্যান করতেন। হাতে থাকত জপের মালা। কোনও কোনওদিন রাত্রে গাড়ি পাঠিয়ে কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্বরানন্দজীকে নিয়ে আসতেন নিজের ডেরায়। গভীর রাত পর্যন্ত চলত আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ আলোচনা (পৃষ্ঠা ৪৮৩)। সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ এই স্বামী ভাস্বরানন্দজীর এক আন্তরিক রচনা 'শোনানে নেতাজী'-ও এই গ্রন্থে সংকলিত। মহারাজ স্মৃতিচারণ করেছেন, ''শোনানে অবস্থান কালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া নেতাজী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বাটীতে আসিয়াছিলেন। সেইদিন ঠাকুর ঘরে তিনি প্রায় আধঘণ্টা কাল ধ্যানাবিষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন" (পৃষ্ঠা ৮৫২)।

এই ধ্যানাবিষ্ট নেতাজীর কথা অন্য ভাষায়, অন্য প্রেক্ষিতে শুনিয়েছেন সম্পূর্ণ অন্য জগতের এক বিশিষ্ট মানুষ—'আজাদ হিন্দ সরকার'-এর প্রচারমন্ত্রী এস এ আইয়ার : ''আমি প্রায়শই অবাক হয়ে ভাবতাম হঠাৎ ঘনিয়ে আসা অনিবার্য বিপদ এবং মৃত্যু মুখে নেতাজী যে-সাহসের পরিচয় দিতেন তার গোপন রহস্য কি। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতাম যে, তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে এই শক্তি লাভ করেন।... তাঁর সুগভীর আধ্যাত্মিকতাই তাঁকে

উপহার দিয়েছিল শান্ত, সমাহিত, অচঞ্চল শক্তি, অপরকে প্রভাবিত করার মতো অপরিমেয় আত্মবিশ্বাস, স্থৈর্য্য, দানশীলতা, স্বতঃ-উৎসারিত নম্রতা এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, হৃদয়স্পর্শী এবং অতি সক্রিয় মানবতাবোধ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যেও তিনি আত্মস্থ হয়ে পড়তেন এবং শান্তি ও নির্জনতার জন্য উদ্‌গ্রীব হতেন, হয়তো আরও একবার ফিরে যেতে চাইতেন হিমালয়ে যেখানে তিনি কৈশোরে ছুটে গিয়েছিলেন এক প্রকৃত গুরুর সন্ধানে। যখন তাঁর মস্তকে সর্বাধিনায়কের টুপিখানি রাজকীয় ভঙ্গিতে শোভা পেত, এক বিশেষ কোণে ছুঁয়ে থাকত তাঁর ডান দিকের ভ্রূ-প্রান্ত, তখনও তাঁর প্রশস্ত ললাটে লেখা ফুটে উঠত—তিনি সন্ন্যাসী" (পৃষ্ঠা ১৫৩)। অলমিতি।

পরিশেষে একটি কথা বলা দরকার। বিবেক-দ্যুতিতে সুভাষচন্দ্রের উদ্ভাসিত হওয়ার এই যে কালানুক্রমিক বিবরণী দেওয়ার চেষ্টা করলাম তার প্রামাণ্য তথ্যগুলি অবশ্যই আলোচ্য গ্রন্থটিতে সংকলিত বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে সংকলিত; অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাসংখ্যাও উল্লেখিত। কিন্তু এই বিবরণীর মূল কাঠামো হিসেবে শিরোধার্য করা হয়েছে স্বামী বলভদ্রানন্দজী রচিত 'সুভাষচন্দ্রের জীবনে ও কর্মে বিবেকানন্দের প্রভাব' শীর্ষক বিস্তারিত প্রবন্ধটিকে (পৃষ্ঠা ২২৭-২৭০)। এই পরিশ্রমী গবেষণা-ঋদ্ধ রচনাটিতে আলোচ্য গ্রন্থের কেন্দ্রীয় বিষয়টি সার্বিকভাবে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

একটি বিনীত প্রস্তাব, কিঞ্চিৎ সম্পাদিত আকারে এই প্রবন্ধটিকে এক পৃথক পুস্তক হিসেবে প্রকাশ করা যেতে পারে। বিবেক-দ্যুতিতে উদ্ভাসিত সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাহলে আরও বেশি মানুষকে অবহিত করা সম্ভব হবে।

লেখকের প্রতি

* শুধু ধর্মীয় প্রসঙ্গ নয়—দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, বরেণ্য সাধক ও মহাপুরুষদের কথা নিয়ে ইতিবাচক লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ ১৫০০ থেকে ৩০০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
* লেখা পাঠাবেন ই-মেলে (nibodhatapatrika@gmail.com), pdf করে।
* প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদ্ধৃতির তথ্যসূত্র অবশ্যই দিতে হবে। উল্লেখ করুন :লেখকের নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশনা সংস্থার নাম, প্রকাশের স্থান ও বর্ষ, খণ্ড (যদি থাকে) এবং পৃষ্ঠা।
* আপনার নাম, সম্পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল নম্বরের উল্লেখ অবশ্যই থাকতে হবে।